বিশাল বিশাল গাছের সারি বন তুড়ে। সেগুন আর শালের ছায়ায় তঙ্গল ঘুতঘুতে অন্ধকার। গাছের পাতায় পাতায় শিশির পড়ার শব্দ-বৃষ্টি এল বলে ভুল হয়। ঝরনার তল গড়িয়ে আসছে। সেই কতদূর থেকে কে তনে। তলের কলকল শব্দ তঙ্গলের কঠিন নীরবতাকে বিদ্রূপ করেই চলেছে। এই হল থলকোবাদ।

লাল মাতির তিলায় ছোট্ট একফালি তমি তুড়ে সুন্দর বাংলো। কাছাকাছি বনকর্মীদের কাঠের ঘর, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে দাকা আর চুতার কতূ গন্ধ। আলো বলতে দু-চারতে হ্যারিকেনই ভরসা।

বাংলোয় পৌঁছে দেখি রাত আততা বাতে। পার্থদা আর শিখাদি খিচুড়ি খেয়ে তল নিয়ে রেডি হচ্ছে। তাওয়ারে যেতে চার মাইল বাইক নিয়ে যাবে। আমাকে দেখে তিজ্ঞেস করল, যাব কীভাবে। কঠিন প্রশ্ন। গাড়ীতে গেলে মুস্কিল। রাতের অন্ধকারেও গাড়ী দেখে তন্তু তনোয়ার পালাবে। তার ওপর হাতীর গোঁসা হলে গাড়ীর বারোতা বাতবে। ড্রাইভার গাড়ীর ভাগ্য নিয়ে চিন্তত। সে নাকি বছর দুয়েক আগে স্বচক্ষে দেখেছে ওয়াচ তাওয়ারের নীচে দুতো হাতী গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে অনেক দূর নিয়ে চলে গেছিল। অবশেষে ঠিক হল পার্থদার নেতৃত্বে হেঁতে যাব। আমরা চারতন আর আমাদের পাঞ্জাবী ড্রাইভার। ব্যাগের খাবার ছাড়া একতা করে শুকনো কাঠের ডাল, তলের বোতল, দেশলাই, সিগারেত, তিনতে তর্চ—এই সম্বল যাত্রী পাঁচতন। যাওয়ার পথে নামতে না নামতেই চৌকিদার রাম সিং গুনে নিল ঃ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—তিন আদমী, দো আওরৎ। তার গোনার ধরনতা ভালো ঠেকলো না। বুকের ভেতরে কোথায় যেন ছ্যাঁক করে লাগলো।—'রাস্তায় কিছু হলে আমার কোন দোষ নেই—' রাম সিং অন্যমনস্ক ভাবেই কথাগুলো বলে আকাশের দিকে তাকাল। আগের দিন ছিল বিত্যা দশমী। কাতেকাত্তেই একাদশীর চাঁদ তখন আকাশে তারা গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে অদৃশ্যকেও দৃশ্যমান করে তুলেছে। চাঁদের আলোয় দিগন্ত বিস্তৃত থলকোবাদ থমথমে-ঘুমন্ত নিষ্পাপ নিস্তেত। সর্দারত্তীও যে ভয় পায় তা তনার পর আমাদের ইচ্ছা ও উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল। সর্দারত্তীকে নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে আমরা চারতন যাত্রা শুরু করলাম। অগত্যা, অন্ততঃ দুতো বাঙ্গালী মেয়ের তেজ ও সাহসের কাছে নতিস্বীকারের হীনমন্যতার চেয়ে এই বিধ্বংসী অভিযানে পা বাড়ানোই শ্রেয় মনে করল সর্দারত্তী। আমি পার্থদাকে বলেছিলাম, 'সর্দারত্তীর রসদ তো আমার ব্যাগে'-মনে রাতের খাবার আর বহু আকাঙ্ক্ষিত এক বোতল মদ।

যে রাস্তা ধরে আমরা হাঁততে শুরু করলাম, তার রঙ কিছুতা লাল, লাল মাতির তয়গা থলকোবাদ। বড় বড় প্রাচীন শাল গাছের মাথা ভেদ করে চাঁদের আলো খুব একতা মাতি পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। এমনকি রাস্তার দুধারে গাছগুলো ও দেখা যাচ্ছে না। পথ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব একমাত্র তর্চের। আহা বেচারা! কি তেরেই না চেপে ধরেছি। ঘুরপাক খেয়ে রাস্তা ক্রমশঃ চড়াই পথে এগিয়ে গেছে। পাশেই তলের নালা। কোথাও সরু, কোথাও চওড়া। রাস্তার উপর দিয়ে তল নালায় গড়িয়ে পড়ছে কোথাও। সর্দারত্তী এইসব তয়গায় বেশ সতর্ক থাকার কথা বলছে। নোনা তল খেতে বাঘ হাতীরা বের হয় শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। কম করে মাইল খানেক উঠে এসেছি। তলের নালায় হরিণের পাল ছাড়া যে আর কেউ তল খেতে আসতে পারে সে কথা কেন যেন কেউই ভাবেনি। মুহুর্মুহু তর্চের আলো বাঁদিকেই বেশি করে ফেলতে লাগলাম। তন্তু দেখার তন্য নয়, বরং না দেখার আশায়। সর্দারত্তী ভয়ে কাতর হয়ে ফিরে যাবার উপদেশ দিল। বছর খানেক আগে নাকি সে তার মিলিতারী ভায়ের সাথে বাইক নিয়ে এসেছিল। তিরিলপোশির রাস্তায় সন্ধ্যার দিকে একতা বাঘের মুখোমুখি পড়ে সে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছিল ঃ চোখে যেই না আলো পড়া, অমনি বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় লাফিয়ে ঘাড়ে পড়ে—কী ভয়ঙ্কর! কোন রকমে চোখ ফেলার সময় না দিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে তারা বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। সর্দারত্তীর বুক কাঁপতে হুরু করেছে। আমাদের সবার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। যত না পরিশ্রম, তার চেয়ে ভয় বেশী। ভয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে আছে। তবু কিছুতেই পিছু হঠার কথা মেনে নিতে পারছি না। বরং সর্দারত্তীর অনুরোধে হাসি পাচ্ছে। সর্দারত্তীর করুণ অবস্থা। তেনেশুনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানে সে খুঁতে পাচ্ছে না। আমরাও মানে খোঁতর চেষ্টাই করছি না। পার্থদা শুধু ভরসা দিয়ে যাচ্ছে। এত আশাবাদী মানুষ আর দেখিনি। শিখাদি ভয়ে ভয়ে একবার বললো 'এ কি পাগলামি!' কথাতা পার্থদার উদ্দেশ্যে। বৈশাখীর ভয় ডর নেই। 'বাঁচলে এক দারুণ বাঁচা হবে। মরলে না হয়ে মরবো' বলে শিখাদিকে উৎসাহ দিল। আমিও তার কথাতাকেই তপ করতে লাগলাম। আসলে ইগো আছে তো। নিতে থেকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব বা না বলব ভাবতেই পারছি না।

রাস্তার উপর হাতীর নোংরামি। তার মানে কিছুক্ষণ আগেই হাতী রাস্তা পার হয়ে গেছে। শিখাদি বলল 'হাতী ঘন্তায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল হাঁততে পারে। ধারে কাছে নেই। তবে তেরে পা চালিয়ে এলাকাতা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিৎ'। বুকের ভেতরতা ঢিপ ঢিপ করছে। বুঝতে পারছি। প্রায় দৌড় লাগিয়েই একতা মোড় পার হয়ে এলাম। ডানদিকে বেশ উঁচু। এখান

দিয়ে নিশ্চয়ই হাতীর দল নামতে পারে না। ভাবছি ঃ বাঁচা গেল। বৈশাখী হেঁতে এগিয়ে গেল খানিকতা। সর্দারত্রী বারণ করল। একা থাকা মোতেই ঠিক না। বাঘ বা চিতা দলে থাকলে আক্রমণ করে না। একা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু বাঘের কথায় একতুও ভয় হল না। কেমন যেন মনে হল সে দেখা যাবে। বৈশাখীকে ধরে ফেললাম সবাই ত্রেরে পা চালিয়ে। আরেকবার মোড় নিয়েছে রাস্তাতা। বাঁ দিকের নালাতা বেশ চওড়া দেখাচ্ছে, ত্রলের গতি কম। রাস্তাতা প্রায় ত্রলের লেভেলে নেমে এসেছে। বুনো গন্ধতা কী তীব্র ! বৈশাখী সর্দারত্রীকে ত্রিজ্ঞেস করল, 'গন্ধতা কোন ত্তন্তর'? সর্দারত্রী দাঁড়িয়ে পড়ে ত্রেরে ত্রেরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'বাইসনের। এখানে অনেক বাইসন আছে।' আমার মনে পড়ে গেল বেতলার সরকারী ত্রিপের ড্রাইভারের কথা। একবার সন্ধ্যের মুখে একতা বাইসন ছুতে এসে তার ত্রিপতাকে গুঁতো মেরে প্রায় উল্তে দিয়েছে, এমন সময় উল্তো দিকের আরেকতা বাইসন সেতাকে গুঁতিয়ে খাঁড়া করে দিয়েছিল। সে যাত্রায় তারা বেঁচে গিয়েছিল, তাই গল্পতা শুনতে পেয়েছিলাম।

আমরা এমন একতা রাস্তায় নেমেছি যার বাঁদিক দিয়ে ত্রলের নালা আর ডান দিকে কোথাও তিলা, আবার কোথাও পাহাড়ের ঢাল। মাঝে মাঝে ডানদিকে ঢালের উপর দিয়ে আকাশের দু একতা তারা আমাদের লক্ষ্য করছে। বাঁদিকে কলকলিয়ে ত্রল গড়িয়ে পড়ছে। মোতামুতি ভাবে খাড়াই পথ। কিলোমিতারের মত যেতে না যেতেই সকলের গায়ের গরম ত্রমা খোলার ত্রেগাড়; যদিও লেপ মুড়ি দিয়েই বাকীরা রেষ্ট হাউসে শুয়ে পড়েছে। বেমক্কা ঝুঁকি নেবার মধ্যে যারা মহত্ব বা বীরত্ব খুঁতে পায় না তাদেরই একত্ন আমাদের সাথী—প্রশ্নতা এখনও প্রশ্নই থেকে গেছে। যদিও চতত্রলদি দুতো উত্তর আবিষ্কার করে সেদিনের যাত্রা পথে অনেকখানি আরাম বোধ করেছিলাম। যাই হোক মাইল খানেক হেঁতে সকলের পা অবশ হয়ে এল। একতা থমথমে পরিবেশে পায়ের শিরা গুলো তান তান হয়ে গেল। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এতক্ষনের আলাপচারিতা নৈঃশব্দে হারিয়ে গেছে। শরীর ত্রুড়ে ক্লান্তি আর অবসাদ ত্রাঁকিয়ে বসেছে। আমরা কোনও অজ্ঞাত কারণে আরও কাছাকাছি হাঁততে শুরু করেছি। কোন পরিকল্পনা ছাড়াই পাঁচত্রেড়া চোখ ক্ষণে ক্ষণে দিগ্বিদিকে কীসের যেন সন্ধান করে চলেছে। নিঃশব্দ নিঃঝুম ত্তঙ্গলের লতাগুল্ম কিংবা শাল গাছ পর্যন্ত নড়ছে না। শুধুমাত্র বুনো গন্ধ আর কলকল ত্রলপ্রবাহ ছাড়া সবই অর্থহীন অবান্তর অস্তিত্ব তিকিয়ে রেখেছে। তর্চের আলোয় পরিষ্কার হল—সামনে বাঁক, বাঁদিকে। ডানদিকে নেমে এসেছে কোন অত্রনা তিলার ঢাল। ঢালতার গা বেয়ে রাস্তা বেঁকে যাবে আবার ডাইনে। সেদিকতায় তর্চের আলো যাবে না। চোখও না—সম্পূর্ণ অত্রনা একতা তার্নিং পয়েন্ত.....আমার চোখ সত্রগ, কান তীব্রভাবে খাড়া, পায়ের শব্দ ক্ষীণতম, বুদ্ধি প্রাখর্যে ভরপুর সাহস কিংবা ভয়ের অনুভূতিতাই যা নেই.....। একতা সময় আমার মনে ছিল না, আমার সাথে যারা আছে,---তারা কী ভাবছে? কী চাইছে? কী দেখছে? কী করবে?--- এমন সময় কানে এল.....'বহিনত্রী'!.....সর্দারত্রীর গলায় একতা কাঁপুনি আমাদের স্তব্ধ করে দিল মুহূর্তের ত্যন্য। মুহূর্তের মধ্যে সংকতকালীন ত্রিজ্ঞাসা অসম্ভব তীব্রতার সঙ্গে উত্তরের প্রত্যাশায় অনুরনিত হতে লাগল। 'ত্রনোয়ারের গন্ধ'—বৈশাখীই উত্তরতা দিল। সর্দারত্রী এই কথাই বলতে চেয়েছিল। সে বলল, 'হাতী গেছে এই রাস্তায়।.....ত্রল খেতে বেরিয়েছে।'.....আমাদের বাঁদিক দিয়ে সমান বেগে ত্রল কলকলিয়ে বয়ে চলেছে, তার থামবার মত সময় নেই। ত্তঙ্গল ধোয়া ত্রল ত্তঙ্গলের বৈশিষ্ট নিয়েই বয়ে চলেছে, তাকে সভ্য করে তোলা অসম্ভব। তার্নিং নেবার পর হাতীর ফেলে যাওয়া কোন কোন চিহ্ন আবারও চোখে পড়ল। আমরা আবার তীব্র বেগে এগুতে লাগলাম। পিছু হঠাৎ কোন প্রশ্নই নেই। বিপদ সামনে পিছনে সমান সমান.....এ যে থলকোবাদ। সর্দারত্রীর সেই ভয়ঙ্কর সব স্মৃতি কিংবা গল্প থলকোবাদ অভিযানের আরেক অনুষঙ্গ। থলকোবাদের চিতা-শিখাদির গল্পে পড়া চিতার মতই চালক। মাইলের পর মাইল সমান্তরালে হেঁতে যাবে, তারপর ঝোপ ঝুপে কোপ। ব্যস, খেল খতম।

থমথমে থলকোবাদের শীত বেশ ত্রাঁকিয়েই এসেছে। ঘাম ঘাম ভাব সত্ত্বেও ঘামছি না। শাল গাছের মাথায় তুপতাপ শিশির পড়তে শুরু করেছে। দূরে কোথাও কোথাও কুয়াশা দেখে ধোঁয়াশা দেখতে লাগলাম। মনে হল বহুদূর হেঁতে এসেছি; যেন একযুগ হেঁতে পার করে দিলাম.....। হাতের ঘড়ি বড্ড স্লো মনে হতে লাগল। এমন একতা রাত আর ফিরবে না। হয়তো এতাই শেষ রাত..... হয়তো ফেলে আসা পৃথিবীতা আর দেখা হবে না। এই থলকোবাদই হয়তো পৃথিবীর শেষ। এই বুনো গন্ধ আর বুনো তন্তুর বোঁতকা গন্ধ, ত্রলের কলকলানি, এই ছায়ান্ধকার, এই মায়াময় নৈকত্য-পাঁচতা মানুষের ভয়ভীতি, সাহস, আনন্দ, দুঃখ, উত্তেত্না নিমেষেই শেষ হয়ে যেতে পারে.....। হঠাৎ আমরা এততাই আপনার হয়ে উঠেছি যে আমাদের পৃথক অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারছি না। ত্রীবন ত্তাৎ সবই মায়াময় মনে হতে লাগল। আমরা যেন একেকত্ন দার্শনিক, চলন্ত দার্শনিক.....এই আছি এই নেই ভাবনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিও আস্বাদিত। যন্ত্রের মত পা ত্রেড়া অসম্ভব গতি প্রাপ্ত হলেও ক্ষান্তি নেই। চোখ কান, মূক, বধির কিংবা অন্ধের চেয়েও অনেক অনেক বেশী সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে।। একফোঁতা শিশির পড়ার শব্দ কিংবা একতুকরো ছায়াও ফাঁকি দিতে পারছে না। কৈশোরে ভূত দেখার নেশায় কত

অমাবস্যায় শ্মশানের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছি; কিংবা কত রাত জেগে কাতিয়েছি চিলেকোঠার অনালার দিকে চোখ মেলে, কত শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত গেছে কেতে; কত ঠকাঠক্ শব্দ সন্দেহ অগিয়ে গেছে; কত গা ছমছম করা বাঁশতলায় পা বাড়িয়েছি বহুবার; কদম গাছের ডালে ভূতের নৃত্য দেখার সাহস দেখিয়েছিল কত রাত্তিরে; বৃষ্টিভেজা রাতের দিনে অনলা খুলে কান পেতেছি কচু বনের দিকে-কত অ্যাডভেঞ্চার! কত পাতি! জীবনতা কত বিরাত আবার কত ক্ষুদ্র! পাঁচশ মাইলের পরিশ্রমে মরতে আসা এই থলকোবাদে! এত কষ্ট করে শেষে রাত বিরেতে আপদ তেনে আনা এই গহীন অরণ্যে! হায়! এ কী নেশা! বুঝি না; বুঝতে পারলে সর্দারজীকে বোঝাতে পারতাম।

হাঁততে হাঁততে কয়েকশ ফুত উপরে উঠে এসেছি। তাই আবার নামতে হচ্ছে। এই ওঠা নামার ভেতর দিয়েই যেন একমাত্র বৈচিত্র্য খুঁতে পাচ্ছি। পা গুলো অন্ততঃ একতু কম কষ্ট পাচ্ছে। তার্নিং পয়েন্ত পেরিয়ে অনেকতা হাঁতার পর হঠাৎ ডানদিকতায় বেশ খানিকতা ফাঁকা অয়গা দেখতে পেলাম। ফাঁকা বলতে ছোত ছোত গাছের মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা আকাশ দেখতে পাওয়া মাত্র। মানে ঘনত্ব কমেছে জঙ্গলের। কিন্তু ভয়ের ক্ষেত্রে উল্তোতা। কারণ এরকম অয়গায় ভুট্টার চাষ করে আদিবাসীরা। আর সেই ভুট্টা ক্ষেতে আসে হাতীর দল। শিখাদি দিনের আলোয় দেখা অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল। মাঝে মাঝে যে দু-চারতে উঁচু গাছ দেখা যাচ্ছে, ওদের তং-এ মাচা আছে। সন্ধ্যের পর আদিবাসীরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। হাতীর দল এলে তারা নাকি কাঁসি বাজতে শুরু করে। আর তাতে হাতীদের বড় গোঁসা হয়; যাকে বলে বোর্ হয়ে অন্যদিকে পালায়। এত সহত ঘতনা ঘতানোর অন্যে আদিবাসীদের কত প্রয়াস! আমরা আবার গভীর জঙ্গলে একতু বাঁদিক ঘেঁষে ঢুকতে শুরু করেছি। শিখাদির কথা শুনে বৈশাখী পালামৌ এর অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করল। সেবার আমিও পালামৌ ঘুরেছিলাম। তাই পুরনো স্মৃতি এ্যায়সা তান দিল যে, আমার গতি মন্দীভূত হল। এবং একযোগে সবাই আস্তে এগুতে লাগলাম। আসলে আবার খাড়াই রাস্তায় চলতে হচ্ছে। তলের নালাতা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। তলের শব্দ কমছে। বরং শাল গাছের পাতায় শিশির পড়ার শব্দ তুপতাপ শোনা যাচ্ছে। থেমে থেমে বুনো পাখিদের ঝতাপতি শুনে অন্যমনস্ক হচ্ছি। কানপেতে শব্দের গতি বোঝার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছি। এভাবেই হাঁতছি।

হাঁততে হাঁততে আর ভাবতে ভাবতে আবার ঢালু রাস্তায় পা বাড়ালাম। কিছুদূর গিয়েই তের পেলাম এ বড় গভীর জঙ্গল। আপদ হলে এখানেই হতে পারে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাস্তা। একশো দুশো ফুত যেতে না যেতেই মোড়। মোড়ের ওপারে যে কি আছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। উঁচু নীচু রাস্তা ধরে একতার পর একতা বাঁক পেরিয়ে যেতে লাগলাম। গায়ের লোম খাড়া। পা চালাতে গিয়ে কোন শব্দও যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে। কারও মুখে কোন রা নেই। লাঠি ঠোকার আওয়াতও কানে ঢুকছে না। এত সন্তর্পণে কখন যে হাঁততে শুরু করলাম তা কেউ খেয়াল করিনি। কারই বা নির্দেশে নীরবে হেঁতে চলেছি তাও জানি না। অবস্থা যাই হোক না কেন, আমরা যে সতর্ক ভাবে একতাই ইউনিত, সেতা ঠিক। তর্চের আলো আর গায়ের গন্ধ ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাউকে সচেতন করে দেবে না। এইভাবে প্রায় দেড় ঘন্তা বাদে এসে হাজির হলাম একতা অয়গায়, যেখান থেকে রাস্তা গেছে দু দিকে ভাগ হয়ে। পার্থ দা বাঁদিকে পা বাড়াতেই শিখাদি বারণ করল। ডান দিকের রাস্তায় যেতে হবে। এতাই প্রথম মোড়। এর পরে আর একতা মোড় পড়বে যেখান থেকে বাঁ দিকের রাস্তা ধরতে হবে। সেখানে একতা সাঁকো আছে। গাছের ডাল দিয়ে সাঁকো করা হয়েছে সদ্য। শিখাদির কথা গুলো পার্থদা মিলিয়ে নিল। সকালেই তারা বাইক নিয়ে রাস্তা ঘাত দেখে গেছে। আমরা ডাইনের রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে গেলাম। বুনো শেয়াল না কিসের ডাক শুনে সবাই থ। তার ওপর শুকনো পাতার ওপর শিশির পড়ার শব্দ যে কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত তৈরী করে ফেলল তা বলার নয়। এক একতা কান একেক রকম শব্দ শুনে চলেছে। কিন্তু মাথা তো একতাই। সিদ্ধান্ত নেবার অবস্থা আর নাই। সবারই অবস্থা ঃ ন যযৌ ন তস্থৌ। মাথার উপর দিয়ে দু চারতে বা কতকগুলো পাখী উড়ে গেল। প্রাণ পাখী খাঁচার ভেতর তবু থবু মেরে পড়ে রইল.....নত নড়ন চড়ন। নীরবতা কতক্ষণ ছিল তা বলতে পারব না। তবে মনে আছে সর্দারজী প্রথম কথা বলার সাহস দেখাল। বৈশাখী আর শিখাদিকে সামনে হাঁততে বলল। আমি বাঁদিকে আর পার্থদা ডাইনে। পেছনে সর্দারজী সবার বড় তর্চ হাতে। এগুতে লাগলাম। কলকাতার বাসের মতন কলকব্জা যত না নড়ল গতি তার চাইতে অনেক কম। বৈশাখীর পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। শিখাদির হাঁতুর ব্যাথাতা চাগিয়ে উঠেছে। হাঁতার ব্যাপারে বাকীদের কোন অসুবিধা নেই। আধ কিলোমিতার মতো খাড়া পথ বেয়ে উঠে চললাম। রাস্তায় গা ঘেঁষে সারি সারি শালগাছ দাঁড়িয়ে। তলায় দুই চারি ফুত ঘাস। পার্থদা বলল, 'শেষের দু কিলোমিতার মতো খাড়া পথ বেয়ে উঠে চললাম। রাস্তার গা ঘেঁসে সারি সারি শালগাছ দাঁড়িয়ে। তলায় দুই চারি ফুত ঘাস। পার্থদা বলল, 'শেষের দু কিলোমিতার পুরো ঘাসে ভর্তি। বর্ষার পরে আমরাই প্রথম ওয়াচ তাওয়ারে যাচ্ছি। রাস্তা ঘাত সবে সারানো হচ্ছে।".....প্রায় অভিযাত্রী দলের মতনই আমরা চলেছি রাতের জঙ্গল ফেঁড়ে ফুঁড়ে.....।

অবশেষে সেই তেমাথার মোড়ে এসে পৌঁছে গেলাম। সত্যিই বাঁদিকে একতা রাস্তা গেছে, কিন্তু এতা তো একেবারে অভেদ্য; শুধু ঘাসে ঢাকা রাস্তা এককালে ছিল বলে মনে হয়। সাঁকোও আছে। তবু.....খত্‌কা লাগছে। পার্থদার কেমন যেন ভাব;.....বোধহয় ভুল হয়ে গেছে।.....আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শিখাদির মাথায় সব ছিল। 'তিরিলপোশির রাস্তাতা ঠিক এমনই ছিল;.....সাঁকোতা ঠিক এমনই নড়বড়ে।.....ভুল হয়ে গেছে—আগের রাস্তাতাই ঠিক ছিল।.....কী হবে?' সত্যি, কী আর হবে? আমরা ভেবে আর করব কি? পার্থদা মনে মনে ছবিতা ভেবে নিয়ে বলল, 'এতাই ঠিক রাস্তা। এই ঘাসের ভেতর দিয়ে হাঁততে হবে দু কিলোমিতার। তারপর একতা বিরাত শিমূল গাছে সাইনবোর্ড লতকানো আছে, ওয়াচ তাওয়ারের পথ দেখিয়ে।' বৈশাখী একতা সন্দেহ প্রকাশ করল, 'রাস্তা কোথায়?.....এ যে ঘাসে ঢাকা!'.....আমি চুপচাপ হিসেব করলাম। সময় আর গড় গতিবেগের হিসেবে চার সাড়ে চার কিলোমিতারের বেশী আসিনি। সর্দারত্নি বলে বসল, 'অন্ততঃ ছয় কিলোমিতার এসেছি।' হাঁতার ব্যাপারে আমার নিত্তের ওপর যততা আস্থা তাতে করে হলফ করে বললাম যে মোতে চার কিলোমিতার হেঁতেছি। সবার প্রশ্ন ঃ 'এত সময় ধরে এইতুকু পথ হাঁতলাম? হঠাৎ ইগো চারিয়ে উঠল। পার্থদা আরও ত্তের দিয়ে বোঝাল রাস্তা ভুল হয়নি। কারণ রাম সিং বলে দিয়েছে চার কিলোমিতারের মাথায় সাঁকো বাঁদিকে। রাস্তা ভালো নেই.....তবু যদি ভুল হয়!.....যদি পথ চলার শেষ না হয়..... !

অনেক সময় রাস্তা ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। এ যে গভীর জঙ্গল। যে কোন রাস্তাই চড়াই-উৎরাই; তলের নালা আর বড় বড় গাছের ছায়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই রকম। তাছাড়া স্বল্প পরিচয়ে জঙ্গলের রাস্তা অচেনাই থেকে যায়। সেই একই শব্দ; সেই একই গন্ধ; মাতির রং একই রকম। তাছাড়া স্বল্প পরিচয়ে জঙ্গলের রাস্তা অচেনাই থেকে যায়। সেই একই শব্দ; সেই একই গন্ধ; মিতর রং একই রকম। সব বৈচিত্র্যই একই চিত্রের প্রতিরূপ হয়ে দেখা দেয়। ত্তোৎস্নালোকে এ ধরা অধরাই। তর্চের আলোয় কততাই বা দেখা সম্ভব? 'পথের শেষ কোথায়?'—একতাই প্রশ্ন যখন ভাবাচ্ছিল, তখন এ কি বিপত্তি! নানান দুর্ভাবনা। দুঃসাহসিক অভিযানের দুঃস্বপ্ন বোধ হয় সত্যি হতে চলেছে। তন্তু তনোয়ার সব তীব্র ক্ষুধা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। 'ফিরে যাব?' প্রশ্নতা কিন্তু সব্বাইকে পেয়ে বসেছে। উত্তরতা কারও মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। সামনে বিপদ, পিছনেও বিপদ। এগোবার সংকল্প নিয়েই যাত্রা শুরু। পিছিয়ে গেলে হেরে যেতে হবে। "হেরে যাবার" মধ্যে যে হীনমন্যতা লুকিয়ে আছে তাকে স্বীকার করার প্রবৃত্তি তখন আর কারও ছিল না। এগিয়ে গিয়ে মরলে হারিয়ে যাব। পিছিয়ে গেলে হেরে যাব—যদি না মরে হারিয়ে যাই। এই 'হেরে যাওয়া' আর'হারিয়ে যাওয়ার' দ্বন্দ্ব যেন সব্বাইকে কুরে কুরে খেতে লাগল। একতা চিতা যদি হাড়গোড় চিবিয়ে খেত তাতেও বোধহয় খুশি হতাম এরকম একতা ভাব কোত্থেকে যে মাথায় ঢুকে গেছে, কিছুতেই আর বের হ'তে চাইছে না। পার্থদা ভাবছে, চারচারতে প্রাণ তার হাতে। সে যা বলবে বাকী চারতন তাই করবে। সে যদি এগিয়ে যায় তো, কেউই পিছনে দৌড় লাগাবে না। কিন্তু যদি রাস্তা ভুল হয়? যদি তাওয়ারে পৌঁছতেই না পারা যায়? আমি ছোতবেলা থেকেই সাহস দেখাবার চেষ্টা করলেও কখনও দুঃসাহসী হ'য়ে উঠিনি। ভয়তাকে অহং এর এত্তাসে বেঁধে রেখেই এতকাল তড়পে গেছি। এবার সে যেন 'বেনিফিত অব ডাউত' পেয়ে ছাড়া পেল। পিছিয়ে গেলে বাঁচলেও বাঁচতে পারি। একতা সুনিশ্চিত আস্তানায় পৌঁছতে পারলেই বেঁচে যাব গোছের ভাব। শেষমেষ বললাম, 'ফিরে যাই। তবে দ্রুতগতিতে।' আর যেই না বলা, তৎক্ষণাৎ সর্দারত্নি নেতৃত্ব নিত্তের হাতেই নিয়ে নিল। অগত্যা বাকীরাও পিছু হততে বাধ্য হল। সর্দারত্নি সান্ত্বনা দিয়ে একতা দারুন সত্যি কথা বলে ফেলল ঃ 'তাওয়ারের রাত কাতিয়ে কী লাভ? রাস্তার অভিজ্ঞতার চেয়েও কি বেশী কিছু?'

হেঁতে ফিরতে হবে কম করেও চার কিলোমিতার। ঢালু রাস্তা, গতি বেশ। তবু ভয় আরও বেড়ে গেল। প্রায় নিঃশব্দে চুপিচুপি ডেরার ফিরে গেলে বাঁচি গোছের ভাব। গুঁড়ি মেরে রাতের চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। নানান বীভৎস চিৎকারে রাত জাগা পাখিরা বুকের ভেতরে একএকবার মোচড় তুলে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদও বাড়ছে।। হাতীর দলের মাঝে পড়লে আর রক্ষে নেই। কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে দু একবার মুখ ফসকে কিছু বলার পরেই ভাবতে হচ্ছে পাশ থেকে কেউ শুনে ফেলল কিনা। আসলে গন্তব্য স্থল নিরাপদ আশ্রয় বলেই শঙ্কা বেশী। আধ ঘন্তা মত হাঁতার পর হাতীর দলের কু-কীর্তি আরও বেশী করে চোখে পড়তে লাগল। পার্থদা বলল হাতীরা ইতিমধ্যে কয়েক কিলোমিতার দূরে সরে গেছে নিশ্চয়ই। কারণ অনেকগুলো হাতী এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল মানেই তারা নতুন কোন দিকে যাত্রা শুরু করেছে। শিখাদি বলল ওয়াচতাওয়ারের দিকেই হয়তো গেছে, সেখানেই তো ভুট্টার ক্ষেত। প্রায় দিনই রাতে হাতীরা ভুট্টার ক্ষেতে যায়। ফিরতিপথে নিঃশব্দে হাঁততে হাঁততে অনুভব করেছিলাম 'বাঁচার তাগিদে কাকে বলে। আসার সময় রোমাঞ্চ ছিল। ফেরার বেলায় বাঁচার তাগিদ ছিল। ফিরে যেতে পারলেই বেঁচে যাব। আমি নিশ্চিন্ত ঃ জঙ্গলে ঢোকার সময় আক্রান্ত হলে সবাই একসঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ফেরার সময় বোধ হয় তা হত না। কারণ সেক্ষেত্রে লক্ষ্য নিরাপদ আশ্রয়।

দেখতে দেখতে থলকোবাদ বনবাংলোয় ফিরে এলাম। রাম সিং সব অতিথিদের খাবার তৈরী করে সরে চুটা ধরিয়েছে। আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে জড়ো করল। ভয়ঙ্কর সময় গুলোর অবসান ঘটেছে—তাতেই সবাই খুশি। কয়েকজন কলকাতাবাসী আমাদের মতো অর্বাচীনদের হঠকারী সিদ্ধান্তের যারা বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়েছিল তারা বেশ উৎফুল্ল হয়ে পড়ল। আর যাই হোক শেষ পর্যন্ত হেঁটে ওয়াচটাওয়ারে তো যেতে পারিনি। কেউ কেউ বলল এই দু কিলোমিটার পায়চারি করেই ফিরেছি হয়তো। তাতে বাহাদুরির কিছুই নেই। বাহাদুরির জন্য তো হাঁটিনি। নেশায় হেঁটেছি বলা চলে। কিন্তু গন্তব্য স্থলে যেতেই হবে। রাম সিং এর শাকরেদ একজনকে পাওয়া গেল। গাড়ীতে গেলে সে পথ চিনিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু গাড়ী থাকলে জন্তুরা কেউ আসবে না। অগত্যা সিদ্ধান্ত হল পার্থদা বাইক নিয়ে গাড়ীর পিছনে পিছনে যাবে। আমরা দুজন টাওয়ারে উঠে গেলে একইভাবে ফিরে এসে গাড়ি রেখে সর্দারজী আর পার্থদা বাইক দিয়ে পৌঁছে যাবে। গণ্ডগোল বাঁধাল সর্দারজী। তার তো বিন্দুমাত্র যাবার ইচ্ছে নেই। তাই সে গাড়ী নিয়ে আগে আগে যেতে নারাজ। অতএব পার্থদা আর গাইড ভীম সিং বাইক নিয়ে আগে আগে যাবে। আর আমরা গাড়ীতে পিছনে যাব। তাই ঠিক হলো। তাতেও বাধ সাধলো গাইড। সে খোলা বাইকে বসতে পারবে না। এ ভয়ানক বিপত্তি। গাইড, যে কিনা জঙ্গলেই জন্মে বড় হয়েছে আর মরবেও এখানেই, সেও ভয় পায়! সর্দারজীর ভয় অমূলক নয়। হাতীর আক্রমনে তার গাড়ির ক্ষতি হলে কি হবে? সে এক্কেবারে বেঁকে বসল। বৈশাখীতে আর শিখাদি কে বোঝাবার চেষ্টা করল। শিখাদি তো তালা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। অবশেষে বুদ্ধি এল। আমি সর্দারজীকে বোঝালাম যে, ভীম সিং কখনও বাইকে চড়েনি তাই ভয় পাচ্ছে। রাম সিংকে দিয়ে কথাটা কবুল করিয়ে নিতেই কাজ হল। ঠিক হল আমি আর পার্থদা বাইকে নিয়ে সামনে যাব আর গাড়ীতে বাকীরা আমাদের ফলো করবে। ভীম সিং গাড়ীতে থেকেই রাস্তা বাতলে দেবে।.....ব্যস। সর্দারজী গাড়ীতে স্টার্ট দিল। আমি আর পার্থদা সামনেই এগিয়ে গেলাম। থামলাম সেখানেই যেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম। ভীম সিং এর সিগ্‌ন্যাল মত বাঁদিকের ঘেসো রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। দুদিকের ঘাস বাড়তে বাড়তে রাস্তায় নেমে এসেছে। রাস্তা দেখাই যাচ্ছে না বললেই চলে। কোনরকমে দু কিলোমিটার অতিক্রম করতেই সেই বিশাল শিমূল গাছ দেখতে পেলাম। তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে আমাদের গন্তব্য। আরো খানিকটা এগিয়ে পার্থদা বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে দিল। একেবারে নিশ্চিন্ত। কিন্তু হাতীর পাল এখানে আসে। দুদিকের বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে ঝোপ ঝোপ কীসব দেখা যাচ্ছে। হাতী ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। হাতী দেখার বিস্ময়ে বিপন্ন বোধ করলাম। পার্থদা মঙ্গল সিং মঙ্গল সিং বলে চেঁচাল। গাছের ওপর থেকে মঙ্গল সিং সাড়া দিল। হাতী এখনো আসেনি। রক্ষে, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পিছনে গাড়িটা এসে যেতেই আমরা এগিয়ে গেলাম এক্কেবারে ওয়াচটাওয়ারের তলায়। বড় বড় গাছের মাঝে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় তিনতলা উচুঁ ওয়াচটাওয়ার। নীচে একটু কুঠরী মতন। পাশ দিয়ে লম্বা কাঠের সিঁড়ি-খাড়াই উঠে গেছে। হাতে পোঁটলা পুঁটলি সব নিয়ে আমি, বৈশাখী আর শিখাদি উপরে উঠে গেলাম। পার্থদা আর সিংজীর দেখতে দেখতে গভীর বনে মিশে গেল। আমি আর বৈশাখী কাগজ দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। শিখাদি কান পেতে রইল, কিছু শোনা যায় কিনা। শিশির বিন্দু এমনই টুপটাপ শব্দে পড়ছে যেন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এসেছে। একাদশীর চাঁদ সারা বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলো ছিটিয়ে দিয়েছে, তবু তিনতলা থেকে নীচের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

অরণ্যপুরীতে, আমরা তিন জন। সভ্য সমাজ থেকে ছিটকে আসা। তবু হৈ চৈ না করে প্রায় নিঃশব্দে সময় গুনতে লাগলাম। শিশিরের টুপটাপ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই পাচ্ছি না। এমন সময় কতকগুলো পাখির ডানা ছটফটানির শব্দ পেলাম যেন। সচকিত হয়ে তিন জন তিনদিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। বেশ বোঝা যায় এ বছর আমরাই প্রথম। জানি না এত কাল ধরে কারা বাস করেছে। ভুত মানিনা; নইলে ভুতই ধরে নিতাম। যাই হোক, আবোল তাবোল ভাবনার ভেতর দিয়ে সময় কেটে গেল। পার্থদার বাইকের শব্দ পেলাম। টাওয়ারের নীচের ঘরে বাইক ঢুকিয়ে তারপর সিংজীকে নিয়ে পার্থদা ওপরে এসে বসল। আমরাও আপাতত নিশ্চিন্ত হলাম।

রাতের খাবার রুটি, তরকারি আর চাটনি। তরকারিটা আলুপোস্ত—ভাবা যায় না! সিংজীর বৌ বানিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে Rum এক বোতল আছে। পার্থদার কাছেও আছে। বৈশাখী ছাড়া সবাই একটু একটু করে Rum নিয়েছি। সিংজী গল্প শুরু করেছে। জঙ্গলের ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা-তার বাবার কাছে শোনা। মেঘাতুবুরু, কিরিবুরুতেও জন্তু জানোয়াররের উপদ্রব ছিল। লোহার খনি আবিষ্কারের প্রথম দিককার কথা সেসব। সিংজীর কথা গুলো ভালোই লাগছিল। সিংজীর মৃত্যুভয় যে কী মারাত্মক তা জানার পর শিখ জাতির প্রতি করুণা না করে পারলাম না। তবে সেসব অন্য পরিবেশে.....।

সিংজীকে ঘুম পাড়িয়ে আমরা চারজন জেগে রইলাম। ফিসফিস করে গল্প করছি। কান খাড়া করে বসে আছি—যদি কোন শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় হাতীর দল কিংবা এক আধটা বাঘ। নিদেনপক্ষে হরিণ কিংবা বুনো শুয়োর। শুনেছি

ভোর রাতে জল খেতে আসে। অতএব জেগে থাকতেই হবে। একাদশীর চাঁদ ডুবতে বসেছে; এখনও কেউ এল না। দেখা দেওয়া তো দূরের কথা সাড়া পর্যন্ত ছিল না। বোধ হয় আসবে না। আসবে কী করে? শিখাদির মনে পড়ে গেল রেস্ট হাউস থেকে বেরোনোর সময়ই তো রাম সিং কী যেন মন্ত্র পড়েছিল। তারপর ভীম সিং এই টাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোয় মাটি নিয়ে কীসব মন্ত্র আওড়ে গেল। সত্যি কথা। ভীম সিং মাটি ফেলে দিয়ে আমাকে ডেকে বলেছিল, 'ভাইসাব কুছ নেহি হোগা। ঘাবড়াও মত।' না হেসে কি পারি? জীবন তুচ্ছ করে রাতের জঙ্গলে হেঁটে বেড়ালাম। বাঘ হাতীর ডেরায় দাপিয়ে বেড়ালাম। আর ভীম সিং বলে কিনা 'ঘাবড়াও মত!'

অবশেষে একাদশীর চাঁদ ডুবে গেল। চাঁদ ডোবার পর চারিদিক একেবারে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ঘোর অন্ধকারে দৃশ্যমান কিছুই রইল না। আর আমরা চার জন জেগে রইলাম। ফিসফিসিয়ে গল্প চলছে। হঠাৎ আলাপেই আমরা একসুরে কেমন বাঁধা পড়ে গেছি। পথের এমনই টান। কোত্থেকে কীভাবে যে চলে এলাম! পার্থদা শিখাদিরা শিমলিপালের জঙ্গলে পারমিট ছাড়াই কোর এরিয়ায় ঢুকে পড়েছিল। তাই বন পুলিশের তাড়া খেয়ে এ অবধি এসে গেছে। রাস্তায় জংলী কুকুরের তাড়া খেয়েছে। গভীর জঙ্গুলে বাঘের মতনই, তবে কালো জন্তু দেখে বড্ড ভয় পেয়েছিল। কালো বাঘের কথা শুনিনি ঠিকই , তবে এই জঙ্গলে অন্ধকারে সবই কালো ও ভয়ঙ্কর ঠেকছে। বৈশাখী বলছে ঘাটশিলা হয়ে চাইবাসা আসার পথের কথা। তারপর কিরিবুরু, মেঘাতুবুরুর দেশ, সেখানকার দশেরা উৎসব। উঁচু নীচু রাস্তা ঘাট, মাঠ ভরে গেল সন্ধ্যে হতে না হতে। হাজার হাজার আদিবাসী রমনী, পুরুষের ঢল। মিশনারী স্কুল থেকে কালো কালো মেয়েরা সাদা স্কার্ট পরে লাইন দিয়ে এসে গেল। তারপর শুরু হল রাবণ পোড়া। দেখবার মতনই। ওখানেই আলাপ হয়েছিল সেগুনীর সাথে। খনি অফিসারের মেয়ে। বাবা শহুরে আর মা এখানকারই। সেগুন গাছে ঘেরা বাংলোয় জন্ম বলে তার নাম হয়েছে সেগুনি। শিখাদি তারিফ করল, 'বাঃ, বেশ নামতো!' সেগুনি মেয়েটি বেশ। জঙ্গল ভালোবাসে। তিরিলপোশি যাবার কথা বলেছিল। তিরিলপোশি এসে পড়ায় পার্থদা বলল, 'তিরিলপোশি পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে উড়িষ্যা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় যেসব আদিবাসীরা থাকে—তারা শিকার করে আর কন্দমূল খেয়েই বেঁচে আছে। চাষবাস নেই বললেই চলে। পোষাক আশাকের নূন্যতম ব্যবহার। এই জংলী মানুষগুলো কী অসাধারণ! কারও কোন অভিযোগ নেই। চাহিদা অত্যন্ত কম। আমরা চাইবাসা আসবার সময় সারা রাস্তা জুড়ে তো আদিবাসীদের সঙ্গে এসেছি। দাকার হাঁড়ি নিয়ে কুটুম্বিতা করতে চলেছে। কেউ বা মুরগী নিয়ে চলেছে। নড়বড়ে বাস থেমে থেমে সারাদিন ধরে একটুখানি পথ পাড়ি দেয়। ঘাটশিলা জায়গাটা কেমন, পার্থদা জানতে চাইল। বৈশাখী সুন্দর ভাবে এমন বর্ণনা দিল যে আমার মনে হল আমি গোধূলিয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি ঃ ঐ দূরের বনতুলসীর জঙ্গল দিয়ে বিভূতিভূষণ হেঁটে চলেছেন, আর তাঁর সামনে পিছনে জংলী মানুষেরা মশাল জ্বালিয়ে চলেছে। যেন তারই প্রতিফলন দেখছি সুবর্ণরেখা নদীর জলে। একেবারে বিচ্ছিন্ন ভূমিতে আমরা তিনজন তখনও জেগে। ফিসফিস করে কথা বলে ঘুম তাড়ানো ছাড়া উপায় কি? পার্থদা শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ বাদে আমিও শুয়ে পড়লাম। এত অন্ধকারে কিছুই তো দেখা যাবে না। যদি কেউ আসে হয়ত শব্দ পাওয়া যাবে—শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটার শব্দ কিংবা চুক চুক করে জল খাওয়ার শব্দ.....। এই ভরসায় কানখাড়া করে শুয়ে আছি। বৈশাখী একাই জেগে বসে আছে। চোখে ঘুম জড়িয়ে এসছে এমন সময় বৈশাখী ঠেলে ঘুম ভাঙ্গাল। 'কি যেন চক চক করছে। বোধহয় কারো চোখ, সবুজ একজোড়া।' হুড়মুড়িয়ে উঠে তাকালাম.....। চলে গেছে,—এ যাত্রায় দেখা হল না। হতাশা ছাড়া আর ঘুমই একমাত্র সম্বল। তাই শুয়ে পড়লাম। কী যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি এমন সময় বীভৎস করুণ চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একইসঙ্গে সবাই জেগে উঠলাম। কান খাড়া করে আরও প্রায় তিরিশ সেকেন্ড টানা সেই আর্ত চীৎকার শুনতে শুনতে কি রকম যেন হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে শব্দটা মিলিয়ে গেল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে। বীভৎস রোমাঞ্চ। আনন্দ বা করুণা কোনটাই হয় নি। তবু কেমন যেন তটস্থ অবস্থা আমাদের। একবার ভাবলাম, যাইহোক, একটা অন্ধকারবিদীর্ণ করা বুকফাটা করুণ চীৎকার তো শুনতে পেলাম। এটাই এখানকার প্রতিটি রাতের চিত্র। বুভুক্ষু প্রানী বাঁচার রসদ পেয়েছে অবশেষে.....। প্রকৃতির বুকে জীবনের শেষ মুহূর্তে, শিকার যে, সে প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতিরই বীভৎসতার বিরুদ্ধে। আমরা সেই শব্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছি। আরও খানিকবাদে হুড়মুড়িয়ে হাতীর দল এল গাছের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে। যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। খট্ খট্ কট্ মট্ কড়্ কড়্ শব্দে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে কোনদিকে যে সব গেল তা বোঝার উপায় রইল না। এবার শুধুমাত্র শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ ছাড়া বনভূমি একেবারেই নিঃস্তব্ধ। তাছাড়া আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সর্বগ্রাসী ভয় শরীর মনকে অবশ করে দিয়েছে। সবাই জেগে বসে রয়েছি। সময় যেন থেমে গেছে। শিখাদি সন্তর্পনে বৈশাখীর পাশে সরে গিয়ে তাকে জড়িয়ে বসে আছে। সবার মাথা ঝিম ধরে আছে। পার্থদা একটা সিগারেট ধরাতেই যেন জীবনের ছোঁয়া ফিরে পেলাম। বৈশাখিও একটা সিগারেট ধরাল। নার্ভগুলোর জট খুলতে

শুরু করল। ভয় অনেকটাই কেটে গেল। সিঁড়ি নীচে কীসের যেন আভা দেখতে পেলাম। যেন সবুজ আলোয় ভেসে গেল। সর্দারজীকে ডাকলাম। টর্চ ফেলে কিছু দেখতে পেলাম না। আবার আলোর ফুলকি—সিঁড়ির গোড়ায়।.....কিছু ভেবে পেলাম না। পার্থদা লাঠি হাতে সিঁড়িতে কয়েক ধাপ নেমে গেল। সর্দারজীও নামল। টর্চ ফেলে ফেলে। কিছুই দেখতে পেলাম না। অগত্যা সবাই সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় গুনতে লাগলাম। সর্দারজীর মাথায় এল। সাপ হতে পারে। অন্ধকারে সাপের মাথায় মণি জ্বলে। ভয় বেড়ে গেল—সিঁড়ি বেয়ে যদি উঠে অসে! কিছুক্ষণ বাদে সব সন্দেহের নিরসন হল যখন একঝাঁক জোনাকির দল উড়ে এল.....। কী আনন্দ! ভয় কেটে গেল। Rumএর বোতলের বাকীটুকু আমি আর পার্থদা নির্জল গলাধঃকরণ করে ফেললাম। গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলতে লাগল। শিখাদি আর বৈশাখী ফিসিফিসিয়ে কথা বলছে। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। কী ভয়ংকর! বীভৎস সুন্দর। আবার বিস্ময়েরও। মনে মনে কত কথার দোলাচল! আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বৈশাখী তখন একা জেগেছিল। নানান টুপটাপ খসখস শব্দ ছাড়াও রাতজাগা পাখিদের তীব্র চীৎকার সে শুনেছে। তার মনে হয়েছে কারা যেন নীচে হেঁটে চলেছে। একমুহূর্তও তার নিজেকে একা লাগেনি। মনে পড়ল নিঃঝুম নিশীথে মৃতমানুষও মানুষের সঙ্গী হয়। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি সেগুনীর কথাগুলো। 'থলকোবাদের জঙ্গল মোহময়ী। তুমি যতই ভেতরে ঢুকে যাবে ততই তোমাকে আকর্ষণ করবে। ভয় যতই পাও, তুমি পালাতে পারবে না। সারা রাত্রির অবসাদ কেটে গেলে ভৈরব যখন ভৈরবীকে ডেকে ঘুম ভাঙাবে তখন থলকোবাদ জেগে উঠবে। তার শান্ত গম্ভীর রূপ দেখতে ভুলে যেও না যেন।'—সত্যিই কথাগুলো ভুলবার নয়। তাই প্রাণপনে জেগে থাকার চেষ্টা করছি। পার্থদা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল-মনে হচ্ছে ব্ল্যাকহোলের মধ্যিখানে বসে রয়েছি। আমাদের প্রাণমন সবই এই অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। অতীত ভবিষ্যৎ সবই যেন একটা বৃত্তে আটকে পড়েছে। এর বাইরে কোনকিছুরই অস্তিত্ব নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই পরিবেশের বাইরে যেতে পারছি কৈ? একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঐ শব্দটা হওয়ার আগে পর্যন্ত। আমার চারিদিকে ঢালু বরাবর দীর্ঘ রঙ বেরঙের গাছের জটলা। আর থেকে থেকে ফোঁসফাঁস শব্দ। কারা যেন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ করে জঙ্গলটা সরে যেতে লাগল। সরু একটা নদী বেরিয়ে পড়ল। তারপর হাজার হাজার জন্তু জানোয়ার নখদন্ত বিস্তার করে এগিয়ে আসছে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলাম, পা নাড়াতে পারলাম না। এদিকে জন্তুগুলো এগিয়ে আসছে। তাদের তীক্ষ্ণ আওয়াজে আর থাকতে পারছি না। উড়তে চেষ্টা করলাম। পায়ের নীচের মাটি ক্রমশঃ উঁচু হতে হতে বিরাট হয়ে গেল। তার উপর দিয়ে রঙ বেরঙের মেঘ আর নীল নীল পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এল। একটা পাখি আমার ঘাড়ে এসে বসল। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই তার গা থেকে বেগুনী রঙের ধোঁয়া বের হতে লাগল। সেই বেগুনী কুণ্ডলী ভেদ করে মানুষের মুখ দেখে আহ্লাদিত হলাম। তার গায়ে হাত দিতেই সে একটা চারপেয়ে জন্তু হয়ে গেল আর আমি তার গায়ে আটকে গিয়ে ছোট হতে লাগলাম। আমার কান দুটো শরীরের তুলনায় বিরাট হয়ে গেল। দোখদুটোও। কতরকমের শব্দ আর মাত্রাতিরিক্ত রঙের তীব্রতা আমাকে গ্রাস করে ফেলল। আর ঠিক তখনই ঐ চীৎকার শুনে তোমাদের সাথে সাথে জেগে উঠলাম। জান, এ জঙ্গল সত্যিই ভয়ঙ্কর। ঘুমিয়েও নিস্তার নেই।' শিখাদি সিগারেটে জোর টান দিয়ে বলল, 'তোমরা আর কেউ ঘুমিয়ো না। আমরা বাকী রাতটা গল্প করে কাটিয়ে দেব।' ফিসফিসিয়ে গল্প করে কারও মুখ না দেখে কি জেগে থাকা সম্ভব? তাই ঘুম আর না ঘুমের মধ্যে সবাই সময় কাটাতে লাগলাম।

আমি ভাবছি এই গভীর অন্ধকার ভেদ করে দূরে বহুদূরে কোনও পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য উঠছে এখন। আলোয় কিছুদূরে দিকবিদিক রঙীন। একটা রঙীন সমুদ্রের দিবাস্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসল। আমি দেখতে পাচ্ছি আলোর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আর বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে আলোর আভা কালো পর্দা ফুটো করে ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হরেক রঙীন পাখিদের ঝাঁক উড়ে আসছে। তাদের সমবেত কিচিরমিচির যেন অর্কেষ্ট্রা। ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কী একটা চেনা সুর ভেসে আসছে....'রাই জাগো। রাই জাগো।'....ছেলেবেলার সেই বুড়োটার প্রভাত সঙ্গীত আজ এই অরণ্যেও আমার ঘুম ভাঙাচ্ছে ঃ চোখ খুলে দেখলাম বৈশাখী গাইছে....রাই জাগো....রাই জাগো....। বনকুমারী জাগছে। তার মাথা থেকে অন্ধকার সরে যাচ্ছে; গা থেকে আঁধার খসে খসে পড়ছে। আর তার সাথে সাথে কত শত রাই কিশোরী জাগছে....।

সমকাল

একটু ভাবুন? বর্তমান জায়গাজমির মূল্যায়ণ কি সঠিকভাবে হচ্ছে?

তুষার কান্তি মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর., বোলপুর

আমরা এখন অনেকেই জানি যে, দলিল রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য কম্প্যুতার মাধ্যম প্রচলন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাজমির মূল্যায়ন ও কম্প্যুতার মাধ্যমে হয়ে চলেছে। ১৯৯৪ সালে West Bengal (PUVI) Rule-1994 প্রচলন হওয়ার পর থেকে রেজিষ্ট্রারীং অফিসাররা জায়গাজমির মূল্যায়ন করে থাকেন এবং এই মূল্যায়ন এর উপর স্ট্যাম্প মাসুল নির্ধারণ হয়ে থাকে। এককথায় সরকারী রাজস্ব আদায় এই জায়গা জমির মূল্য নির্ধারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাহা সবসময় এখনও পর্যন্ত্য রেজিষ্ট্রি অফিসের সঙ্গে যুক্ত সফটওয়ার **কর্ড** দ্বারা সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না বলে আমার ধারণা। তাই আমরা যদি সবাই মিলে, বিশেষ করে আমরা যারা এই দফতরের সঙ্গে বহুদিন থেকে যুক্ত তাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাস্তবিক সমস্যাগুলিতে দ্রুত সমাধান করতে পারি, তাহলে জায়গাজমির সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ও বৃদ্ধি পাবে। তাই আমার এই লেখার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সঠিক পদক্ষেপ নেবার জন্য আমার প্রস্তাব পেশ করছি। আমি আরও আশা করবো আমার মতো আরো অনেকেই তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত ও প্রস্তাব দেবেন এবং কর্তপক্ষ সমস্ত প্রস্তাব বিচেনা করত কর্ড সফটওয়ারের পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটিয়ে আরো সমৃদ্ধশালী করবেন। প্রয়োজন অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা দরকার যাহারা সমস্ত প্রস্তাব বিবেচনা করবেন এবং সঠিক প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন।

এখন আসা যাক এই কর্ড সফটওয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে কি কি সমস্যা আমরা সম্মুখিন হচ্ছি এবং ঐ সমস্যাগুলি কিভাবে সমাধান করা সম্ভব। এক এক করে আলোচনা করা যাক।

আমাদের সামনে এখন প্রথম এবং প্রধান সমস্যা বিক্রিত বা দানকৃত ভূমি সম্বন্ধে ভুল তথ্য দেবার সমস্যা এবং উক্ত ভূমি কিভাবে ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ (Proposed land use) ভবিষ্যতে উক্ত ভূমি কিভাবে কিভাবে ব্যবহার হওয়া সম্ভব।

এই প্রধান ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করার আগে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিবেচনা করা উচিৎ। যেমন—

(১) সমস্যা প্রকৃতপক্ষে কি? সংক্ষিপ্ত উত্তর-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে জমির মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যা দ্বিগুন থেকে আরম্ভ করে ১০-১৫ গুণ হতে পারে।"

(২) যারা রেজিষ্ট্রি করতে আসছেন তারা এই নিয়ে কি ভাবছেন? সংক্ষিপ্ত উত্তর-বেশীরভাগ জনগণ চাইছেন সরকারী মূল্য যেন তাদের বিক্রিত মূল্যের থেকে বেশ কম হয়।

(৩) আমরা যারা জায়গাজমির মূল্যায়ন করছি, তারা কিভাবে দেখছি? সংক্ষিপ্ত উত্তর-আমরা বেশীরভাগ চাইছি কম্পিউটার দ্বারা অভিন্নমূল্য নির্ধারণ হউক। যে কোন অফিস বা ব্যক্তি দ্বারা একই মূল্য হবে এবং ওটা দ্রুত সমাধা হউক।

(৪) এর সঙ্গে দুর্নীতি কতটা জড়িত? সংক্ষিপ্ত উত্তর-তথ্য গোপনের সুযোগ প্রচুর, ফলে দুর্নীতি হতে পারে।

(৫) সরকার কিভাবে দেখছেন? নিশ্চয় সরকার জনগণের স্বার্থে স্বচ্ছ, পরিষ্কার দূর্নীতিমুক্ত পদ্ধতি চাইবেন, তাতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে, করবেন।

এখন আলোচনা করা যাক, সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে কি? যখন কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে জায়গাজমির মূল্য নির্ধারণ করতে আসেন এবং নির্দ্ধারিত ফর্ম পুরণ করে জমা দেন, তখন আমরা ঐ নির্ধারিত ফর্ম অনুসারে কম্পিউটারে এন্ট্রি করাই, তারপর ভেরিফিকেশন করে মূল্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রদান করি। যদি কোন ভুল তথ্য প্রদান করে কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সম্পত্তির মূল্য কমাবার জন্য মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নেয়, সেক্ষেত্রে সবসময় আমাদের বোঝা সম্ভব হয় না। ফলে সম্পত্তির মূল্য কমে যায় এবং সরকারী রাজস্বে ফাঁকি পড়ে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের সর্বাগ্রে ভাবনাচিন্তা

করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে যেভাবে মানুষের মধ্যে সরকারী কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভুল তথ্য দেবার জন্য শাস্তি পাচ্ছে না। ফলে অপরাধ করার প্রবণতা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আমরা যারা মূল্য সম্বন্ধীয় তথ্য দ্রুত পরীক্ষা করার কথা ভাবছি, মিথ্যা তথ্য দেবার দায় ও পরিণতি আবেদনকারীর শাস্তি চাইছি, কেহ কেহ বেশী সংঘাতের মধ্যে না যাওয়ায় ভালো ভাবছেন। কেহ কেহ আবার এটাকে ব্যবসায়ীক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন। চাকরীর মোটা মাইনে তো আছেই তার সাথে যদি সরকারী পদ্ধতিতে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত কিছু রোজগার হয় তাহলে মন্দ কি? যাদের উপর নজরদারীর ভার তাদের সংখ্যা এতই কম যে নজরদারী আর হয়না বললেই চলে, যারাই বা দায়িত্ব নিয়ে নজরদারী করতে চান তাদের ভাগ্যে জোটে দুর্বৃত্তদের একত্রিত হামলা, রাজনৈতিক চাপ, কিংবা সরকারী উদাসীনতা ও আইনী জটিলতা। কেহ কেহ আবার নজরদারীকে ব্যবসায়ীক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। যাইহোক সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ। সরকার নিশ্চয় চাইবেন, সাধারণ মানুষ উপকার পান, দ্রুত রেজিষ্ট্রিকার্য সমাধা হউক এবং সরকারী রাজস্ব যতটা সম্ভব অধিক পরিমাণে রাজ্য কোষাগারে সমৃদ্ধ করুক। এটা করতে গেলে কিছু পরিবর্তন তো আসতেই হবে এবং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কি কি পরিবর্তন আন সম্ভব? পরিবর্তন বা পরিবার্জন করতে গেলে আগে জানতে হবে কি কি ভুল তথ্য প্রদান করছে কিভাবে সেটা প্রতিরোধ করা যায়। অস্থায়ী সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য জরুরী।

ক) সম্পত্তির অবস্থান অর্থাৎ কোথায় সম্পত্তিটা অবস্থিত, বাজার হাটের মধ্যে নাকি রাস্তার ধারে, কিংবা মাঠের মধ্যস্থলে। সমাধানের সংক্ষিপ্ত উত্তর-মৌজা ম্যাপ প্রবেশ করানো।

খ) সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা, অর্থাৎ কৃষিজমি নাকি ব্যবসায়ী জমি।

সমাধানের সংক্ষিপ্ত উত্তর BL & LRO Record থেকে জমির বর্তমান অবস্থান বা Spot Verification করে তা দেখা।

গ) কারা খরিদ করছে বা বিক্রি করছে। সমাধানের সংক্ষিপ্ত উত্তর-কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটা নির্দিষ্ট গাইড বা নিয়মাবলী প্রদান করা।

ঘ) কি উদ্দেশ্যে খরিদ করছে অর্থাৎ কোন কারখানার জন্য জমি কিনছে কিনা। সমাধানের সংক্ষিপ্ত উত্তর-কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটা নির্দিষ্ট গাইড দ্বারা সমাধান করা।

ঙ) কারা দখল করে অর্থাৎ বর্গাদার আছে কিনা। সমাধানের সংক্ষিপ্ত উত্তর-কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটা নির্দিষ্ট গাইড দ্বারা সমাধান করা।

ভুল তথ্য দিয়ে বলছে, কোন সম্পত্তির ব্যবসায়ীক উপযুক্ত স্থান হলে বলছে, মাঝমাঠে কোন রাস্তা নাই। পাকা রাস্তা থাকলে কাঁচা বলা হচ্ছে। বাস্তু ভুমিকে শালি কিংবা শুনা বলে চালানো হচ্ছে। শহর অঞ্চলে রাস্তার চওড়ার উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্দ্ধারণ হয়, তাই সেখানে রাস্তা কম দেখানো হচ্ছে, বাড়ির বয়স নতুন হলে বলা হচ্ছে ৫০ বৎসরের পুরানো কিংবা মোজাইক এর মেঝে থাকলে বলা হচ্ছে সিমেন্টের মেঝে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কি কি নতুন উপায় বার করছে ঃ—

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বসতবাটীর জন্য ভূমির চাহিদা বাড়ছে, তেমনি কৃষি থেকে বাস্তুভূমিতে রূপান্তর হচ্ছে। তাই জমির মূল্য কম দেখাবার জন্য একাধিক ক্রেতার বাস্তুর উদ্দেশ্যে কেনা ভূমি, একত্রে একটি দলিলে চাষের জমি হিসাবে চাপাতে চাইছে। কোবলা দলিলের পরিবর্তে কেহ কেহ লিজ (দীর্ঘমেয়াদী) দলিল কিংবা পাওয়ার ওফ এ্যাটোরনি দলিল করে রাজস্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের পুরাতন দিনের কথায় একটু ফিরে যাওয়ার দরকার। তখন আমাদের MVMR অর্থাৎ Market Value Monitoring Registrar ছিল। আমরা যারা মূল্যায়ন করতাম প্রথমত পাশাপাশি জমির মূল্য সম্বন্ধীয় তালিকা থেকে বা অন্যান্য দাগের ভূমির সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে। যদি দেখা যেত বিক্রিত জমি, পূর্বের বিক্রিত জমির মূল্যের থেকে বেশী বা কম হওয়া দরকার তখন আমরা সেইভাবে Appreciation বা Depreciation দিয়ে মূল্য করতাম। দাতা বা গ্রহীতার দাখিলিকৃত ফরমের সম্পূর্ণ তথ্য সত্য বলে ধরা হত না। প্রয়োজনে আমরা মৌজা ম্যাপ দেখতাম বা Spot Verification করে মূল্য নির্দ্ধারণ করতাম। তখন আমাদের সামনে কিছু যুক্তিসম্মত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ছিল যেমন Comparative Method বা Belting Method ইত্যাদি। কিছু মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন ছিল। তার উপর সমস্ত অফিসগুলিতে একই রকমভাবে যাতে মূল্য নির্ধারণ হয় তার জন্য নির্দিষ্ট গাইড লাইন থাকত। D.S.R. কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট অফিসে মূল্য নির্ধারণের জন্য ফরম পাঠিয়ে দিত। অন্য অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত সম্পত্তি থাকলে সেই অফিসে মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হত। ফলে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মূল্যায়ণ হত। হয়ত সেই মূল্যায়ণ একটু বেশী সময় নিয়ে হত কারণ দলিল Pending রাখা যেত। কিন্তু যারা মূল্যায়ণ করতেন তারা কিন্তু নিজেরা মূল্য নির্ধারণ করে নিজেরা

সন্তুষ্ট হতেন এই ভেবে যে, যথাযথ মূল্যায়ণ করা হয়েছে। দাতা কিংবা গ্রহিতা রেজিষ্ট্রারিং অফিসারের মূল্যায়ণে সন্তুষ্ট না হলে D.I.G.R. নিকট Appeal করতে পারতেন। D.I.G.R. মূল্যায়ণ যথাযথ হয়নি মনে হলে Divisional Commissioner এর নিকট আবেদন করতে পারতেন বা প্রয়োজনে মহামান্য High Court এ আবেদন করতে পারতেন। অর্থাৎ একটা সু-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। যেহেতু অফিসারের মূল্যায়ণের উপর স্ট্যাম্প বা ফিস প্রদান করতে হত, তাই তখন দলিলের মধ্যে কম মূল্য দেখিয়ে দলিল পেন্ডিং রাখার প্রবণতা দেখা গেছে। ফলে তখন অফিসারের মূল্যায়ণের পর বহুদিন দাতা বা গ্রহিতা ঘাটতি স্ট্যাম্প বা ফিস না দিয়ে দলিল ফেলে রাখত। তারপর সময়মত দিয়ে কিংবা সরকার ছাড় ঘোষণা করলে ঘাটতি স্ট্যাম্প মাসুল ও ফিস দিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পূর্ণ হত। তখন কিন্তু একটা দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পূর্ণ করতে বেশ সময় নিত। ২০০৭ সালে প্রথম কম্প্যুটার মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন এর সিদ্ধান্ত। প্রথমে প্রথমে অফিসে কম্প্যুটার বসিয়ে পুরাতন ডাটা কম্প্যুটার এ এন্ট্রি করা হয়। আমরা ভাবলাম এই ডাটা ব্যাঙ্কগুলি আমাদের রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবে যা বাস্তবে হয়নি। তারপর আমাদের দ্বারা পূরণ করা হল সমস্ত মিসিং দাগের মূল্য। সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে। যখন মিসিং প্লটের মূল্য দেওয়া হয় তখন আমাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট গাইড বা সফট্ওয়ারের মাধ্যমে কিভাবে মূল্যায়ণ হতে যাচ্ছে তার কোন নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বলা হয়েছিল, শহরের ক্ষেত্রে সমস্ত মিসিং প্লটকে বাস্তু হিসাবে এবং গ্রামের ভূমি চাষের জমি হিসাবে মূল্য প্রতি শতক হিসাবে প্রদান করতে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হয়েছে অফিসের সমস্ত কাজ সেরে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে। ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্য প্রদান হয়নি। এরপর দেওয়া হয়েছিল সমস্ত রাস্তার নাম ও তার চওড়া কতটা, যদিও এখন আর সফট্ওয়ারের ঐ সমস্ত ডাটার দেখা পাওয়া যায় না। সবশেষে দেওয়া হয়েছিল কনভারসন রেসিও। অর্থাৎ এক শ্রেণি থেকে আর এক শ্রেণিতে পরিবর্তন হলে কতটা মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে, যদিও আমরা কখনও এই কনভারসন রেসিও দ্বারা মূল্যায়ণ পদ্ধতি ইতিপূর্বে কোথাও পাই নাই। আমরা পেয়েছি কমপ্যারেটিভ পদ্ধতি বা রাস্তার ধারে অধিক পরিমাণের ভূমির জন্য বেল্টিং পদ্ধতির দ্বারা মূল্যায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। আদৌ কি কনভারসন রেসিও দ্বারা জমির মূল্যায়ণ সঠিকভাবে করা সম্ভব? যদি ১০ শতক কোন ভূমিকে চাষযোগ্য ভূমি হিসাবে ধরে মূল্য করাহয়, প্রতি শতক ২০০০ টাকা বা মোট মূল্য ২০০০০ টাকা, তাহলে ঐ ভূমি যখন ৬ শতক বিক্রি হয়, তখন বাস্তু হিসাবে ধরলে কনভারশেসন রেসিও দ্বারা মূল্য দাড়ায় ১২০০০ x ৬ = ৭২০০০ টাকা। এখন আপনি ভাবুন কোন মূল্যটা সঠিক হচ্ছে। আমরা যারা প্রতিদিন ১০০ -১৫০ টি জমির মূল্যায়ণ করি, তখন কি তাদের সমস্ত দাগের মূল্য কি হিসাবে দেওয়া হয়েছে তা কি মনে রাখতে পারি। কিংবা যন্ত্র কি আমাদেরকে কোনভাবে সাহায্য করছে। আপনি কম পরিমাণের জায়গা বাস্তু, ভিটি সমতুল্য হিসাবে মূল্যায়ণ করতে না পারলে ভাগ্যে জুটতে পারে উপরওয়ালার শোকজ কিংবা আপনার বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ। আবার আপনি মূল্য বেশী করে থাকলে প্রস্তুত হোন কিছু লোকের চোখ রাঙানি বা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রতিবাদের নামে অভদ্রতা এবং নাকানি চোবানি খাওয়ার জন্য। এইভাবে কতদিন চলতে পারে? কিছু করা যায় কিনা? একটু ভাবুন।

২০০৭ সালে কম্প্যুটার মাধ্যমে জমির মূল্যায়ণ ও রেজিষ্ট্রি কার্য্য শুরু হলেও ৫ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও **কর্ড ২** সফট্ওয়ারের এখনো সাবালকত্ব হয়েছে কি? কোথাও কোথাও মূল্যায়ণ খুবই কম হয়ে যাচ্ছে আমার কোথাও মূল্যায়ণ অত্যাধিক বেশী হয়ে যাচ্ছে। তাই সবাই মিলে ভাবার সময় এসেছে কিভাবে সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়। এমন একটা সফট্ওয়ার দরকার যা যে কোন অফিসে এমনকি তৃতীয় কোন ব্যক্তির মূল্য নিদ্ধারণ করলেও যেন একই মূল্যায়ণ হয়।

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন বিষয়ে একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে। "Indian evidence is a mixture of truth, untruth, non-truth and false truth" সুতরাং সেই দেশের ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের বেশীরভাগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সরকারী স্ট্যাম্প মাসুল ফাঁকি দেবার চতুরাবৃত্তি বলে ধরাহয়। কি তথ্য দিলে কম্প্যুটার কি ফলাফল দেবে তা দলিলের কাজে যুক্ত ব্যক্তিগণ ভালোভাবে রপ্ত করিয়াছেন। যেমন রাস্তা চওড়া কম দেখানো। পাকা রাস্তাকে কাঁচা রাস্তা বলে চালানো। বাস্তু ভূমিকে চাষের জমি বলে চালানো। গৃহের বয়স বেশী করে দেখানো, মেঝে সিমেন্টের বলে চালানো ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এখন মূল্য যতদূর সম্ভব সর্ব্বনিম্ন কিন্তু Fixed মূল্য হওয়া দরকার? কোলকাতা ও হাওড়া এলাকায়, আরবান বা শহরতলির কিছু স্থানের, যেহেতু প্রায় সমস্ত ভূমি সর্বনিম্ন বাস্তু যোগ্য। তাই এখানে একটা আলাদা পদ্ধতি অবলম্বন করে মূল্যায়ণ করা হয়। এখানে যেহেতু রাস্তার নাম ধরে মূল্য নির্দ্ধারণ করা আছে, তাই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের তারতম্য ঘটে। তাই সমস্ত মিউনিসিপ্যালটিতে ঐরূপ পদ্ধতি চালু হওয়া প্রয়োজন।

এখন কি কি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, তা নিম্নে আলোচনা করা যাক। প্রস্তাবগুলি যথা—

১) কোন স্থানের মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে সবথেকে জরুরি ঐ দাগের অবস্থান জানা। **এরজন্য দরকার মৌজা ম্যাপ যার সাহায্যে আমরা সহজে কোন দাগের অবস্থান জানতে পারবো।** এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের যেমন সফট্ওয়ার বানিয়েছেন NIC, তেমনি ভূমি ও রাজস্ব দফতরেও সমস্ত মৌজা ম্যাপ বানিয়েছে NIC এবং এখনও কাজ